# বানপট : গান এবং পালা

**অদিতিনাথ সরকার**

মেদিনীপুর বন্যায় ভাসেনি এমন একটা বছর খুঁজে পাওয়া কঠিন। সরকারি নথি ঘাটলে দেখা যায় উনিশ শতকেও বন্যারোষে বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে এই জেলা। ইংরেজ প্রশাসকের লিপিতে এই ছবি পরিষ্কার। একটি দশকের কথা ধরা যাক : ১৮৩০-১৮৪০। এই এক দশকেই '৩১, '৩২, '৩৩, '৩৪, '৩৯ এবং '৪০ সালে ছ'বার বন্যায় ভেসেছে এই দেশ। উপকূলবর্তী জেলা হওয়ার ফলে কয়েকবার জলোচ্ছ্বাস আর ঝড়ের কবলেও পড়তে হয়েছে মেদিনীপুরকে। এরকমই প্রলয়ঙ্কর ঝড় হয়েছিল ১৮৬৪ সালেও। সেবার গোটা জেলায় ঝড়ে মৃত্যু হয়েছিল ৩৩,০০০ মানুষের।

পরে রোগ ও খাদ্যাভাব মিলিয়ে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষে মোট ৬৬,০০০ লোক প্রাণ হারান মেদিনীপুরে। তাণ্ডবের শেষে গোটা তমলুক শহরে মাত্র সাতাশটি বাড়ি ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। সাম্প্রতিক অতীতে জেলায় সব থেকে ভয়াবহ বন্যা হয় ১৯৭৮ সালে। কেবল মেদিনীপুরে নয়, পশ্চিমবঙ্গের আরও অন্তত আটটি জেলা প্লাবিত হয়েছিল সেবারের বন্যায়। প্রায় চার মাস কাল পশ্চিমবঙ্গের বিরাট অংশ ছিল জলের কবলে। সেনা নেমেছিল উদ্ধারের কাজে। হেলিকপ্টার থেকে মেদিনীপুরের সেই বন্যা দেখার পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, 'ভয়াবহ বন্যা'। "যেদিকে তাকাই শুধু জল। যেন সমুদ্র। কোনও কোনও এলাকা বিশ ফুট জলের নিচে", লেখেন সাংবাদিকরা।

এমনই এক প্রলয়ঙ্কর বন্যার পরে সেই বানভাসি নিয়ে গান বেঁধেছিলেন দুখুশ্যাম চিত্রকর—তাঁর "বন্যার বিবরণের"[১] গান। দুখুশ্যামের সেই 'বানপট'-ই বর্তমান নিবন্ধে মূলে আলোচ্য। এই পট আমি সংগ্রহ করেছিলাম মেদিনীপুর জেলার তমলুক থেকে, ১৯৮১ সালে।

পট বলতে এখানে জড়ানো পটের কথা বলা হয়েছে। ১৪"×২২" 'কার্ট্রিজ পেপার' পর পর চারখানা জুড়ে তৈরি হয় একটা জড়ানো পট। ওই কাগজের উপর বিষয়ভিত্তিক ছবি আঁকেন চিত্রকর। আলোচ্য পটটি নয়াগ্রামের দুখুশ্যাম চিত্রকরের আঁকা। তমলুক শহরের সংলগ্ন এলাকায় বহু পটই চিহ্নিত করেন দুখুশ্যাম।

আলোচ্য পটটি খাড়াখাড়ি নয় ভাগে ভাগ করা। প্রত্যেকটি ভাগ পৃথকভাবে চিহ্নিত। পটে ছবি এমনভাবেই আঁকা হয় যাতে পটটাকে জড়ানো অবস্থা থেকে খাড়াখাড়িভাবে খুলে দেখানো যায়। এই ধরনের "শোভন" সংস্করন ছাড়াও রয়েছে সাধারণ পট।

১. দুখুশ্যামের পটটির নাম : 'বন্যার বিবরণ'পট

সেগুলি অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং ছোট ( ১১″×১৬″ ) কাগজে করা। সাধারণ পটের জন্য ফুলস্কেপ মাপের লেখার কাগজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

"বন্যার বিবরণ" পট-এর চিত্রিত ছবি ১১ ইঞ্চি চওড়া। ছবিগুলোর আবার দু রকমের আকার রয়েছে। প্রথম ছবি ১১″×১২″ দৈর্ঘ্যের। বাকি ছবিগুলো ৬ থেকে ৭ ইঞ্চি লম্বা। প্রথম ছবিটি দেখানো শুরু হয় উপর দিক থেকে। সঙ্গে শুরু হয় গান। আর ছবিটি হল বিস্তীর্ণ নীল জলরাশির উপর মকর বাহনে উপবিষ্ট গঙ্গাদেবী। জলে ঢেউ। আর সেই জলে ভাসছে মানুষের মাথা। তাদের চোখ বোজা। সম্ভবত তাদের মৃত বোঝাতে। গরু মোষের মাথাও ভাসতে দেখা যায়। জলে অবশ্য মাছও থাকে। সবকটি ছবির-ই চারপাশে দেড় ইঞ্চি ঘের দিয়ে ফুল লতা পাতা চিত্রিত। এ হল ছবির ফ্রেম। ঘেরের ভিতরাংশে ওপরে এবং দুপাশে কালো রেখা।[১]

দ্বিতীয় ছবিতে ( ৬″×১১″ ) দুটি বাড়িতে দু'জন করে লোক। একটি খড়ের চালা ঘর, অন্যটি ইটের তৈরি পাকা বাড়ি। তৃতীয় ছবিটি সামান্য বড় ( ৬½″×১১″ )। ছবিতে শুধুই বন্যার জল। জলে ভাসছে মৃত মানুষের মুণ্ডু। ভাসছে খড়কুটো আর মাছ। আর ভাসছে গৃহস্থের আসবাবপত্র। ছবিতে আর একটা অদ্ভুত জিনিস রয়েছে : একটা কলা গাছের ভেলা ভাসছে। তার উপরে এক সধবা নারী। তিনি সন্তান প্রসব করছেন। পরের ছবিতে দুটি পুরুষ মূর্তি একটি ঘরে ও দুটি নারীমূর্তি অপর ঘরে। হাসপাতালের দৃশ্য। চতুষ্টয়ের দুজন মৃতপ্রায়। দেওয়ালের তাকে ওষুধের শিশি। পরের ছবিতে চশমা পরা দুই ডাক্তার রোগী চিকিৎসায় রত। মধ্যে দণ্ডায়মানা চতুর্ভুজা মা কমলা।

পরের ছবিটা বেশ মজার, প্রথম দর্শনেই একটা ধাক্কা লাগে। একটি নল-আকৃতি বস্তু। তাতে জানলা রয়েছে। সেখানে দুটি পুরুষ মুখ। সেই নল-আকৃতি বস্তুর নিচে এবং ওপরে লাল কালো চাকতি। চাকতিগুলো ওই নল-আকৃতি বস্তুর সঙ্গে জুড়ে আছে। ওই চাকতি আসলে ঘূর্ণায়মান রোটর্ ব্লেড আর গোটা ছবিটা হল হেলিকপ্টারের। আর জানলায় ওই পুরুষ মুখ দুটি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ও প্রধানমন্ত্রী দেশাইয়ের। বন্যা দেখছেন আকাশ থেকে। পরের ছবিতে আবার বন্যার জল, ভাসছে মৃত মানুষ ও পশু। তবে তারই মধ্যে চলেছে ধোঁয়া উড়িয়ে স্টীম-লঞ্চ। আর চলেছে দুই আরোহী নিয়ে, চাকাওয়ালা "গাড়ী নৌকা, বা অ্যাম্ফিবিয়াস্ যান।"

পরের দুটি ছবিতে দাঁড়িয়ে দুজন লোক আর অন্যরা তাঁদের সামনে করজোড়ে নতজানু। এটা হল স্থানীয় মানুষের কাছে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠনের অফিসারদের জরুরি ত্রাণ বিলি করার দৃশ্য। তার পরের ছবিটি ৭″×১১″ মাপের। ছবিতে নীল জলের ওপর একটি নৌকার গলুইয়ে দাঁড়িয়ে এক মাঝি। নৌকার তিনদিকে

১. দুখুশ্যামের ছাপা পটটি দেখে নিতে পারেন। পটটি বহুবর্ণ চিত্রিত। ছাপায় অবশ্য রঙ রাখা সম্ভব হয়নি।

তিনটি ভাসমান শব। অপর পার্শ্বে আবার সেই গঙ্গাদেবী। মকর বাহনে উপবিষ্ট, পটের প্রথম ছবিরই পুনরাবৃত্তি।

এই পটগুলো আঁকেন পটুয়ারা। এঁদের পটিদার বা চিত্রকরও বলা হয়ে থাকে। এঁরা পট নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উবু হয়ে বসে সেই জড়ানো পটগুলি খুলে দেখান। আর পটের দৃশ্যমান অংশের চিত্রণ বর্ণনা করে গান করেন। বিনিময়ে গৃহস্থের কাছ থেকে চিত্রকররা পেয়ে থাকেন টাকা পয়সা, চাল ডাল বা অন্য কোনো সামগ্রী। মেদিনীপুরের তমলুক অঞ্চলে বসবাসকারী এই পটুয়াদের মধ্যে সগোত্রে বিবাহের রীতি। পটুয়াদের বাস পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তবে মেদিনীপুর আর বীরভূম জেলাতেই এঁদের এখন বসবাস সবচেয়ে বেশি।

দুই জেলার পটুয়াদের পট চিত্রণের রীতিতে স্পষ্ট ফারাক রয়েছে। তা ছাড়া বীরভূমের পটুয়ারা তাঁদের বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে অনেক বেশি রক্ষণশীল। পটের বিষয় তাঁরা মোটামুটি পুরাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। বাংলার জাতিতত্ত্বের ইতিহাসে অদ্ভুত রহস্যে-ঘেরা এই সম্প্রদায়টির অবস্থান স্পষ্টতই হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের মধ্যবর্তী জায়গায়। কারও মতে এঁরা 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ' কথিত 'নবশাখ' বা সৎ শূদ্রদের নয় শাখার একটি। আবার কেউ মনে করেন এঁদের উদ্ভব আদিবাসী মূল থেকে। মুসলমান ধর্মের চিরন্তন রীতি অনুযায়ী এঁদের মধ্যে খতনা প্রথা চালু আছে। বিবাহ, মৃত্যু এবং তালাক সংক্রান্ত সব অনুষ্ঠানই হয় কাজির উপস্থিতিতে। কিন্তু তাঁরা জীবনের যাবতীয় কাজকর্মে হিন্দুদের মতোই পদে পদে পঞ্জিকা মেনে চলেন। আবার অষ্টমঙ্গলা এবং বধূবরণের মতো হিন্দু লোকাচার মেনে বিয়ে করেন পটুয়ারা। বাংলার গ্রামীণ হিন্দু দেব দেবী—সবার প্রতিই এঁদের অগাধ শ্রদ্ধা। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে কোনো বাড়িতেই গান শোনাতে যেতে বাধা নেই পটুয়াদের তরফ থেকে। বিষয় নির্বাচনে তাঁরা মুসলিম ধর্মের চেয়ে হিন্দু ধর্মের উপরেই বেশি নির্ভর করেন। কিন্তু সব থেকে রহস্যের ব্যাপার হল : পটুয়াদের দুটি করে নাম, একটি মুসলমান অন্যটি হিন্দু।

পট দেখিয়ে বা গান গেয়ে পটুয়াদের আজ আর পেট চলে না। এবং নিকট অতীতেও কখনো পটুয়ারা এই জীবিকায় পেট ভরাতে পারতেন কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। ফলে পেট চালানোর আরও সব নানান উপায় খুঁজতে হচ্ছে। কেউ হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি গড়েন, কেউ গড়েন মাটির গয়না কিংবা ঘর সাজানোর জিনিস, মাটির পুতুল বা খেলনা বেচে পেট চালান কেউ। এঁদের এক বড় অংশ ঝালাইয়ের কাজে পারদর্শী। আবার এইসব শিল্পীদের কেউ কেউ দূর দূর গ্রামে সাইকেলে করে সস্তার সামগ্রী ফেরি করেন, কেউ হাতুড়ে ওষুধ বেচেন আর বহু পটুয়াই এখন ঘরামি কিংবা নিতান্তই দিন মজুর।

এমনই এক সম্প্রদায়ের লোক দুখুশ্যাম। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তমলুকের আশপাশের অঞ্চলে পটুয়া হিসাবে তাঁর বেশ নাম ডাক। আবার পটের

ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ আছে বাইরের এরকম বহু মানুষও তাঁকে চেনেন। এই দুখুশ্যাম প্রকৃত অর্থেই একজন সমকালীন, এমনকি আধুনিক মানুষও বটে, এবং সর্বোপরি তিনি একজন ঐতিহাসিক। এই তাঁর গান :

১। শুনেন শুনেন সর্বজন শুনেন দিয়া মন
বের করেছি নতুন বই, বন্যার বিবরণ।

২। [বলে] তেরশ প'চাশি সালে চোদ্দই ভাদ্রেতে
[বলে] দুর্ঘটনা ঘটে গেল মেদিনীপুর জেলাতে॥

৩। ডিভিসি'র জল [ভাই] প্রবল বেগে আসে
ছাগমেষ আর গরুবাছুর আসছে ভেসে ভেসে।

৪। [ভাই] ভেসে আসে রুই কাতলা কতই পোষা মাছ
লিখিতে পারিনি আমি, পেটে নাই যে ভাত॥

৫। গঙ্গা বাহির হ'ল বেগে [বলে], বলে গুরুজন
মা গঙ্গার খেলা যেমন, অসুর দলন।

৬। বন্যা দেখে সরকার থেকে সাহায্য দিতে এল
[তখন] ধনী গরিব সকলকে সাহায্য নিতে হল॥

৭। আমাদের জীবনে [ভাই] বন্যা দেখি নাই
সেই কারণে ডিঙ্গি নৌকা কিছুই মোদের নাই।

৮। কলার মান্দাসে চড়ে রিলিফ আনতে হল
তার মধ্যে এক যুবতি প্রসব হইল॥

৯। এসব দৃশ্য দেখে [ভাই] চোখে জল আসে
মানুষ কিংবা জিনিষপত্র আসছে ভেসে ভেসে।

১০। পোনা মাছের দাম মাত্র দুতিন টাকা হ'ল
মাছ খেয়ে কত লোক, পরলোকে গেল॥

১১। সেই জন্য সরকার থেকে ডাক্তার পাঠাইল
[সেই] ভেক্‌সিন ইন্‌জেক্‌সন ডাক্তার বাড়ী বাড়ী দিল।

১২। কোথা ওগো মা কমলা জগত জননী
[বলে] ষাট কোটি জীবের মুখে আহার যোগাও তুমি॥

১৩। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু দ্বিতীয় ভগবান
দয়া করে বাঁচাও মোদের ছেলেপুলের প্রাণ।

১৪। কোথায় ওগো প্রধান মন্ত্রী মুরারজী দেশাই
আপনার কাছে আমরা সবাই আপত্তি জানাই॥

১৫। ঋণ দাও, সার দাও, দাও বীজ ধান
চাষকরে বাঁচাইব সকলের প্রাণ।

১৬। বার জেলায় বন্যা হল বলে গুরুজন
শত বৎসরের বুড়া বলে, দেখিনা কখন॥

১৭। চিড়া দিল গুড় দিল দিল চাল গম
যদিনা পেতাম মোরা ছেড়ে যেত দম।

১৮। হোগলা দিল ত্রিপল দিল দিল জামাকাপড়
বাবুরা দেখে বলে গেল যেন লঙ্কা গড়॥

১৯। হেলিকপ্টারে চেপে বাবুরা সাহায্য দিতে এল
কারও কোন দোষ নেই ভাই মা গঙ্গা মারিল।

২০। "সিড্" সংস্থা হল্যান্ড মেদিনীপুরে এল
ভ্যাক্সিন, ব্লিচিং পাউডার তারা ঘরে ঘরে দিল॥

২১। গাড়ি নৌকা নিয়ে তারা লোকজন তুলিল
রামকৃষ্ণ মিশন এসে খিচুরি রান্না দিল।

২২। অন্নবস্ত্র সাহায্য করে ভারত সেবাশ্রম
'জেঠু' নাম প্রকাশিল বাবু নিরঞ্জন॥

২৩। বিক্রম সেন, জয়নাল সাহেব সাহায্য দিয়ে গেল
মাদুর, সার বীজধান তারা ঘরে ঘরে দিল।

২৪। নৌকা নিয়ে একজন মাঝি মাছ ধরিতে গেল
নদীর মাঝে এক যুবতী দেখিতে পাইল।

২৫। সেই মেয়েটি বলে "আমি খেয়েছি তিনপাশ"
মাঝি বলে "হায় হায় একি হ'ল সর্বনাশ"॥

২৬। "তিন পাশ খেয়ে এক পাশে করেছি বসতি।
আমায়ে ছুয়ো না বাবা করি যে মিনতি।

২৭। আমি সেই গঙ্গা" বলে বলিল মাঝিরে
মাঝি এসে সেই কথাটি দিল প্রকাশ করে॥

২৮। এইখানেতে থেকে গেল আরও অনেক বাকী
আরও কিছু লিখব [বাবু] যদি বেঁচে থাকি॥

২৯। এইখানেতে শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা
নাম দুখুশ্যাম চিত্রকর নয়া হয় ঠিকানা।

১৫। ঋণ দাও, সার দাও, দাও বীজ ধান
চাষকরে বাঁচাইব সকলের প্রাণ।

১৬। বার জেলায় বন্যা হল বলে গুরুজন
শত বৎসরের বুড়া বলে, দেখিনা কখন ॥

১৭। চিড়া দিল গুড় দিল দিল চাল গম
যদিনা পেতাম মোরা ছেড়ে যেত দম।

১৮। হোগলা দিল ত্রিপল দিল দিল জামাকাপড়
বাবুরা দেখে বলে গেল যেন লঙ্কা গড় ॥

১৯। হেলিকপ্টারে চেপে বাবুরা সাহায্য দিতে এল
কারও কোন দোষ নেই ভাই মা গঙ্গা মারিল।

২০। "সিড্" সংস্থা হল্যান্ড মেদিনীপুরে এল
ভ্যাক্সিন, ব্লিচিং পাউডার তারা ঘরে ঘরে দিল ॥

২১। গাড়ি নৌকা নিয়ে তারা লোকজন তুলিল
রামকৃষ্ণ মিশন এসে খিচুরি রান্না দিল।

২২। অন্নবস্ত্র সাহায্য করে ভারত সেবাশ্রম
'জেঠু' নাম প্রকাশিল বাবু নিরঞ্জন ॥

২৩। বিক্রম সেন, জয়নাল সাহেব সাহায্য দিয়ে গেল
মাদুর, সার বীজধান তারা ঘরে ঘরে দিল।

২৪। নৌকা নিয়ে একজন মাঝি মাছ ধরিতে গেল
নদীর মাঝে এক যুবতী দেখিতে পাইল।

২৫। সেই মেয়েটি বলে "আমি খেয়েছি তিনপাশ"
মাঝি বলে "হায় হায় একি হ'ল সর্বনাশ" ॥

২৬। "তিন পাশ খেয়ে এক পাশে করেছি বসতি।
আমায়ে ছুঁয়ো না বাবা করি যে মিনতি।

২৭। আমি সেই গঙ্গা" বলে বলিল মাঝিরে
মাঝি এসে সেই কথাটি দিল প্রকাশ করে ॥

২৮। এইখানেতে থেকে গেল আরও অনেক বাকী
আরও কিছু লিখব [বাবু] যদি বেঁচে থাকি ॥

২৯। এইখানেতে শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা
নাম দুখুশ্যাম চিত্রকর নয়া হয় ঠিকানা।

‘বন্যার বিবরণ’ পট

দুখুশ্যাম চিত্রকর

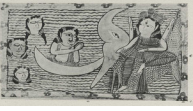

৩০। পিংলা আমার থানা বটে রাস্তা বহুদূর
সবং আমার হয় পরগণা, জেলা মেদিনীপুর ।।[১]

দুখুশ্যামের গানের দুটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চকিতেই আকৃষ্ট করে : বিশদ বিবরণ চারপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সমৃদ্ধ প্রতিবেদন এবং তাঁর অভ্যুত বিন্যাস কৌশল। কিন্তু কেউ যদি দুখুশ্যামের গানে 'গবেষণামূলক বাস্তবতা' খুঁজতে চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি এর প্রাসঙ্গিকতাটাই বুঝতে পারবেন না। আবার 'অন্যের' জ্ঞানতত্ত্বীয় রীতি-নিয়মকে অস্বীকার করার যে কর্তৃত্ববাদী কৌশল আছে, তার দ্বারাও প্রভাবিত হন অনেকে। অথচ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ওই বন্যার সপ্তাহের খবরের কাগজ, কিংবা 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি'-তে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো থেকে ঘটনা এবং বিষয় সংক্রান্ত এমন কিছু বাড়তি বিবরণ পাওয়া যায় না, যা দুখু-শ্যামের গানে নেই। বন্যারোধে ডিভিসি-র ব্যর্থতা এবং কোথাও কোথাও বন্যার কারণ হয়ে ওঠার ঘটনাগুলিই ছিল প্লাবনের প্রথম কয়েক সপ্তাহে প্রধান খবর। বন্যার ত্রাণ নিয়ে রাজনীতি, ত্রাণ সামগ্রীর অপ্রতুলতা এবং বন্যা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সঙ্ঘাত ইত্যাদি বিষয়গুলো তখন চকিতে জাতীয় রাজনৈতিক স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল।

ওই বিধ্বংসী দুর্যোগের অবস্থা নিয়ে দুখুশ্যামের যে প্রতিবেদন তা ভুক্তভোগী দর্শকের পক্ষেই সম্ভব। এবং সে প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষদর্শীর অনুপুঙ্খ বর্ণন। দুখুশ্যাম আবার ডিভিসি-র ভূমিকার ব্যাপারেও রীতিমতো ওয়াকিবহাল। যদিও কেবল অব্যবহিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তাঁর সেই জ্ঞান। যে সব ব্যক্তি বা সংগঠন ত্রাণের কাজ করেছেন তাঁদের ত্রাণ এবং ত্রাণের ধরন-ধারণ সব কিছুর প্রতিই তাঁর সতর্ক নজর। ত্রাণের রাজনীতিটাও লক্ষ করেছেন দুখুশ্যাম, যে রাজনীতির সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অবশ্যই দেশের প্রধানমন্ত্রীও যুক্ত। যে দক্ষতায় দুখুশ্যাম তাঁর বর্ণনাকে বিশদ করেছেন তা মনে রাখার মতো। সাধারণভাবে কোনো বর্ণনাই এক লাইনের বেশি নয়, দু লাইনের বেশি কদাচ ব্যয় করেননি তিনি। এবং প্রত্যেকটি বর্ণনাকে পাশাপাশি সংস্থাপিত করে তা থেকে ক্রমান্বয়ে একটি গোটা চেহারা ফুটিয়ে তোলেন। এখানেই তাঁর কাজের ধরন সম্বন্ধে আমরা কিছুটা রহস্যের মধ্যে পড়ে যাই। বর্ণনার এই রীতি আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খায় না। পারম্পর্যগত যুক্তি মেনে কোনো কিছুকে সংগঠিত করতে না পারলে আমাদের মন ভরে না। আমরা দুখুশ্যামের গানে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘোষণাত্মক বাক্যমালার ভিতরে ব্যাখ্যামূলক নীতির ব্যর্থ সন্ধান করি। একটা কাজের আসল বিচ্ছিন্নতা তার বিষয়ের মধ্যে নয়, আঙ্গিকে। তেমনি দুখুশ্যামের গানের বন্দনা অংশটুকু বুঝতে হলেও আমাদের বুঝতে হবে আঙ্গিক এবং দুখুশ্যামের স্টাইল।

---

১. বন্যার বিবরণ : দুখুশ্যাম চিত্রকর ( গ্রাম : নয়া )।

একটা সম্পূর্ণ ছবিকে ফুটিয়ে তুলেছেন অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনায়। ধ্বংসের পৃথক পৃথক দৃশ্য, মানুষের দুর্দশা, ক্ষমতাবানের কাছে প্রার্থনা, দুর্দশা দূর করার বিভিন্ন ব্যবস্থা ইত্যাদি নানান টুকরো বর্ণনা মিলে মিশে তৈরি ওই গোটা ছবিটা। প্রত্যেকটি পৃথক বর্ণনা, একটার সঙ্গে পরেরটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে সংযোগকারী অব্যয় কিংবা অন্তর্ভাবার্থক অব্যয়ের সাহায্যে। আবার কোথাও কোথাও সেটুকুও ব্যবহার করা হয়নি। বাচনিক আঙ্গিকে সরল উপস্থাপনার মাধ্যমে এমন একটা ছবি ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে যা চলমান। সবটা মিলে যেন বা একটা নাটকীয় উপস্থাপনা। বিবরণ শুনতে শুনতে শ্রোতার মধ্যে যেন ওই দুর্যোগের ভয়াবহতায় আটকে পড়ার একটা অনুভূতি হতে থাকে। এবং সেই অনুভবটাই যেন বার বার ফিরে ফিরে আসে, কারণ একটা ঘটনার উপর আর একটা ঘটনা এসে মিশে যেতে থাকে—ঘটনাগুলোকে পৃথক করাও প্রায় অসম্ভব। কোনও একটা বর্ণনার উপর কখনই স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে কোনো ঘটনাকেই প্রায় অন্যটির থেকে আলাদা করা যায় না। পৃথক পৃথক ঘটনাগুলো অতএব তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একটি সরল নিসর্গ দৃশ্য রচনা করে এবং তা দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই নিসর্গ দৃশ্যে যেন ছোটখাট টুকরো রচনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কবিতাটি তাই কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায় না। তবে ওই কবিতায় রয়েছে চারটি ভিন্ন ধরনের বিবৃতি। শুরুতেই পটুয়া তাঁর দর্শক-শ্রোতাকে সরাসরি সম্বোধন করেন। প্রথম লাইনেই শ্রোতাকে 'নতুন' শুনতে আহ্বান জানানোর পর ঘটনার দিনক্ষণ বলে দেওয়া হয়। শেষ চার পঙক্তিতে 'ভণিতা'—যেখানে পটুয়া তাঁর নিজের পরিচয় দেন। আবার একদিক থেকে কবিতার সবকটি পঙক্তিই ওই প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা যায়, কারণ সংযোগকারী অব্যয়ের মাধ্যমে তিনি বর্ণনাগুলোকে জুড়ে জুড়ে নিরন্তর শ্রোতার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। ঘটনাগুলি একটি আর একটির পিছনে প্রায় পরম্পরাহীনভাবে চলতে থাকলেও স্বতন্ত্র এবং পৃথক ওই ঘটনাগুলোকে জুড়ে দেওয়ার কাজ করছে ওই সংযোগকারী অব্যয় (গানে [ ] ব্র্যাকেটে চিহ্নিত করা রয়েছে)। গানের ধরনটাই এমন যে তা ঘটনার গতির সঙ্গে সঙ্গে এগোয় না। কোনও ঘটনারই ব্যাখ্যা নেই। যেন, সত্যি সত্যিই বন্যার কাহিনী শুরু 'ডিভাইস' দিয়েই। কিন্তু বন্যার বাস্তব কারণ হিসেবে তা কখনোই দেখানো হয়নি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে প্রচুর ঘোষণামূলক বাক্য, এমন কিছু বাক্যবন্ধ, যা অসম্বন্ধ বিচিত্রসব ঘটনার বিবরণ দেয়। বিবৃতির এই অংশে মূলত প্রকৃতি, ব্যক্তি পুরুষ অথবা নারী কিংবা কোনও গোষ্ঠীর কাজের বিবরণ। এই অংশটির আরও একটি ভাগ করা যায়, যেখানে কানে শোনা বিবৃতির প্রতিবেদন রয়েছে—সেগুলোর উপস্থাপনাও অবশ্য ঘটনার মতোই। এর সংখ্যা অবশ্য মাত্র তিনটি, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি শুরু হয় এভাবে ঃ

বার জেলায় বন্যা হল বলে গুরুজন
শত বৎসরের বুড়া বলে "দেখিনা কখন"॥

আমাদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী 'তথ্যগতভাবে' বিবৃতিগুলি 'সত্য'। সত্যিই পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ অংশের ১২টি জেলা নজিরহীন বর্ষণে প্লাবিত হয়েছিল। পরিবেশ দফতরের রেকর্ড মোতাবেক বিগত একশ বছরে ওইরকম বর্ষণ হয়নি। কিন্তু অধিক গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর গানের অন্য একটি সংলাপ—তা থেকে দুখুশ্যামের গোটা কাজটার প্রকৃতি উপলব্ধি করার দিকনির্দেশ পাওয়া যায় ঃ

"গঙ্গা বাহির হল" [ বলে ] বলে গুরুজন
মা গঙ্গার খেলা যেমন অসুর দলন ॥

আবার 'উচ্চতর ক্ষমতাগুলোর' কাছে আবেদন করা হয়েছে পরপর কয়েকবার। এবং এটাকেই আমরা বলছি তৃতীয় ধরনের বিবৃতি। পয়লা আবেদন দেবী লক্ষ্মীর কাছে। দ্বিতীয় আবেদন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে, শিশুদের প্রাণ রক্ষার জন্য। তিনিই তো 'দ্বিতীয় দেবতা'। তৃতীয় এবং শেষ আবেদন 'এক নম্বর দেবতা' প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের কাছে। কারণ তিনিই তো ঋণ এবং সারের ব্যবস্থা দুর্গতদের পুনর্বাসনের সংস্থান করবেন। এঁরা এমন তিন 'শক্তি', যাঁদের শক্তিশালী প্রভাব সাধারণ মানুষের ভাগ্যের ওপর এবং এঁরা কাজ করেন সরাসরি এবং সাধারণের নিয়ন্ত্রনের বাইরে। এই তিন 'শক্তির' কাছে সমানভাবে আবেদন করা হয়েছে যথোচিত আশীর্বাদ চেয়ে—লক্ষ্মীকে খাদ্য উৎপাদনশীলতার জন্য, জ্যোতিবসুর কাছে জরুরিভিত্তিক সহায়তার জন্য এবং মোরারজি দেশাইকে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের জন্য। দুখুশ্যাম বেশ স্পষ্ট করেই জানেন কার কাছ থেকে কী পাওয়া যাবে।

চতুর্থ পর্বের বিবৃতির একটিই মাত্র নমুনা রয়েছে, কিন্তু গোটা কবিতাটি উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে তা "মডেল" হতে পারে। কবিতার একেবারে গোড়ায়, বানের জল ঢুকে পড়ার বর্ণনা শেষ করে যখন আমরা শুনি···

"গঙ্গা বাহির হ'ল" [ বলে ] বলে গুরুজন"

এটা বলা হয়েছে এমনভাবে যেন এ সবই মা গঙ্গার 'খেলা'। এর পরে আরও কয়েকটি পঙক্তি রয়েছে যাকে চতুর্থ পর্যায়ের একমাত্র নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

নৌকা নিয়ে একজন মাঝি মাছ ধরিতে গেল
নদীর মাঝে এক যুবতী দেখিতে পাইল।
সেই মেয়েটি বলে "আমি খেয়েছি তিনপাশ"
মাঝি বলে "হায় হায় একি হল সর্বনাশ" ॥
"তিন পাশ খেয়ে এক পাশে করেছি বসতি
আমারে ছুঁয়ো না বাবা, করি যে মিনতি।
আমি সেই গঙ্গা" বলে বলিল মাঝিরে
মাঝি এসে সেই কথাটি দিল প্রকাশ করে ॥

এই একমাত্র জায়গা যেখানে বন্যার চূড়ান্ত একটা কারণ হাজির করা হয়েছে। মা গঙ্গা

'গ্রাস' করেছেন তিন দিক। বন্যা হয়েছে তাঁরই ইচ্ছেয়। কারণ তিনি চান অন্য তিন দিকের মানুষ গিয়ে ওই একটা দিকে বসবাস করুক। আরও একটি কারণেরও ইঙ্গিত রয়েছে, তা হল মা গঙ্গার 'খেলা'। এই কারণগুলো যদি একবার বিশ্বাস করে নেওয়া যায় তাহলে অন্য কোনও কারণ খোঁজার আর প্রয়োজন থাকে না। অন্তত দুখুশ্যাম এবং শ্রোতা-দর্শকের কাছে অন্য কোনও কারণের অস্তিত্ব থাকারই প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই পঙক্তি কটির বৈশিষ্ট্য হল এখানে 'প্রকাশ'-এর কথা বলা হয়েছে। একে ব্যাখ্যা না করা গেলেও কবিতার অন্য ঘটনাগুলো এই অংশটুকু দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। বহু দুর্যোগের পর মা গঙ্গা নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

দুখুশ্যাম খুব যত্ন করে অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার। দুখুশ্যামের বর্ণিত ঘটনার মধ্যে যদি আমরা 'প্রামাণিকতা' খুঁজতে যাই তাহলে আমাদের সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য সূত্রের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। দুখুশ্যামের 'কীভাবে'-র মধ্যে সত্যিই কোনও রহস্য নেই। আর 'কেন' হল তার ব্যাখ্যার উপকরণ, এবং তা আমাদের খুবই একটা অচেনাও নয়, যদিও হয়ত আমাদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। আবার দুখুশ্যামের গানের নান্দনিক বিন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে এই 'কেন'।

দুখুশ্যাম অতএব ঘটনাগুলির ভাষ্য দেওয়ার একটা প্রকরণ নির্মাণ করেন। হেরোদোতাস থেকে টয়েনবি পর্যন্ত তাবৎ ঐতিহাসিকরা কি এটাই আরও ভালভাবে করতে চেয়েছিলেন? তথ্যের পৃথক পৃথক উপাদানগুলো আর ছড়ানো ছেটানো নয়, তা আর বিচ্ছিন্নও নয় বরং তার একটা স্বীকৃতিযোগ্য সাংস্কৃতিক আঙ্গিকও রয়েছে।

'প্রকাশ'-এর জন্য যে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি, তা দুখুশ্যামের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তন এবং সুনির্দিষ্টতা এই প্রকরণের পক্ষে জরুরি। এ কোনও অনির্দিষ্ট 'প্রকাশ'-এর বিবরণ নয়। এ ঘটনা ১৩৮৫ সনের এবং এর ভাষ্যকার দুখুশ্যাম চিত্রকর, সাকিন গ্রাম নয়া। এখানেই বেশ একটা মজার প্রশ্ন উঠে আসে: তমলুকের জনসাধারণের মধ্যে এই যে 'গঙ্গার' ধারণা, তা কি এই রকম ধারাবাহিক প্রকাশে'রই সংকলন মাত্র? তাহলে কি ইতিহাসই সেই মাধ্যম যেখানে দেব দেবীদের ঠাঁই? দুখুশ্যামের মতো একজন পেশাদার বুদ্ধিজীবী এবং সাংস্কৃতিক বিশেষজ্ঞের কাছে 'গঙ্গা' কী অর্থ বহন করে? এই শব্দটি কি কেবল যুগবাহিত সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলারই ইঙ্গিত দেয়?

দুখুশ্যাম তাঁর কাজকে বলেন 'বই'। এবং তাঁর কাজের ওপর একটা মালিকানার স্বত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি এটা করেন। কিন্তু এই দুটি কাজের মধ্য দিয়ে 'লোককৃষ্টি' বিষয়ে দুটি অতি প্রচলিত বিশ্বাস ধ্বংস করে দেন। বিশ্বাস দুটি হল: 'লোককৃষ্টি' গোষ্ঠীগত এবং মৌখিক। এই দাবির সত্যতা বিচার করা খুবই কঠিন। একই বিষয় নিয়ে অন্য পটুয়াদের জড়ানো পট এবং আনুষঙ্গিক গান আরও পাওয়ায়। সেগুলোর মধ্যে ফারাক নাম মাত্রই। পটুয়া সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে, একজনের ছবি বা গানের অংশে অন্যজন হামেশা ব্যবহার করে বিশেষত জনপ্রিয় বিষয়গুলোতে। নিজেদের মধ্যে এ ব্যাপারে বোঝাপড়া রয়েছে। একজন পটুয়ার গান বা কবিতার যে সংগ্রহ তার সঙ্গে

অন্যদের সংগ্রহের খুব ফারাক থাকে না। কখনও কেউ হয়ত অন্যের চেয়ে একটু ভাল গান বাঁধে কিংবা ভাল ছবি আঁকে।

১৯৭৮-এর বন্যার মতো কিছু কিছু নজিরহীন ঘটনা নিয়ে লেখা কবিতার বই বেরোয়। বইগুলো স্থানীয় প্রেসে ছাপা সস্তার বই। গাঁ গঞ্জের মেলায় হাটে বিক্রি হয়। এমনও নয় যে ওই কবিতাগুলো সবসময় পটুয়ারাই লিখছেন। তবে এমন কোনও বই আমি খুঁজে পাইনি যেখানে দুখুশ্যামের গান আছে। কিংবা তাঁর অনুকরণও তেমন চোখে পড়েনি। অবশ্য দুখুশ্যামের কবিতাগুলোও আয়তনে ছোট। তা দিয়ে এক ফর্মার (১৬ পৃষ্ঠা) একটা বই করাও সম্ভব নয়। বই কথাটা অবশ্য এখানে নানা অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গ্রাম শহর নির্বিশেষে সিনেমার দর্শককুল কাহিনীচিত্রকে 'বই' বলে উল্লেখ করেন। এক সময় নিশ্চয়ই বহু সিনেমাই হত উপন্যাস অনুসারী এবং সে উপন্যাস বই হিসেবেও পাওয়া যেত। কিন্তু এখন আর ওই মুদ্রিত গল্প, উপন্যাসের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রায়শই কোনও যোগাযোগ নেই। দুখুশ্যামের 'বই'-এর অবশ্য এরকম বহুবিধ ব্যবহার নেই।

দুখুশ্যামের কাজের মাধ্যম হতে পারে মৌখিক বা লিখিত, মুদ্রিত বা পাণ্ডুলিপি আকারে, কিংবা ছবি অথবা গান। প্রকরণ যাই হোক না কেন তা অবশ্যই একটি আলোচনার অংশ। 'উৎপত্তি' অলীকত্বের ওপর জোর না দিয়ে বরং কোনও কাজের বিষয়ই বিবেচ্য হওয়া উচিত। দুখুশ্যামের ক্ষেত্রে এই কাজ হল : গান এবং পালা।

যাঁরা 'নিচের তলার' তাঁরা সব সময় 'চুপ' থাকেন না। দুখুশ্যামের কথোপকথনের শ্রোতৃবৃন্দের যে সচেতনতা, তা কিন্তু কলকাতার দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর পাঠকদের চেয়ে মোটে বেশি নয়। এটাও স্পষ্ট করে জেনে রাখা দরকার যে তিনি এই সত্যটির ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কিন্তু এটাকে তিনি অন্ধ ভক্তির পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান না। তাঁর উদ্দেশ্য ঘটনাবলীর একটা "মানে" করা।

গান এবং জড়ানো পট নিয়ে দুখুশ্যামের কাজের গোটা সংগ্রহটাকে ভাগভাগ করতে গেলে তা হবে নিছকই একটা বাহিরঙ্গের ভাগাভাগি। দুখুশ্যাম নিশ্চয়ই তা ওভাবে করবেন না। উল্টে, মহাভারতের গল্প থেকে বন্যা পর্যন্ত তার যাবতীয় কাজ যেন একটানা একটি কথোপকথন। প্রত্যেকটি পট এবং গানের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, তা একটি ঘটনা বা নাটকীয় পরিস্থিতি-নির্ভর। এবং একটি 'প্রকাশ'-এর বিষয়গত ভিত্তিও বটে। আবার এই ভাগাভাগি কেবলমাত্র কোনও সূত্র এবং 'যুগ'-কে চিহ্নিত করে না। দুখুশ্যামের গানগুলোর এক ধরনের সূত্র হল দুটি মহাকাব্যের ঘটনা। যেমন : তাড়কা বধ, সেতুবন্ধন, রাবন বধ, দাতা কর্ণ। দ্বিতীয় সূত্রটি হল পুরাণ। যেমন : সতী-সাবিত্রীর গল্প, এবং রাজা হরিশ্চন্দ্র। বৈষ্ণবীয় গানগুলিকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় : রাধা-কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা এবং শ্রীচৈতন্যের জীবনের নানান উপাখ্যান। এই ধরনের আখ্যানের উপাদান যেমন রয়েছে মঙ্গলকাব্যে, তেমনি রয়েছে দেবী চণ্ডী এবং মনসাকে নিয়ে রচিত জড়ানো পট এবং গানেও। যেমন : চণ্ডীমঙ্গল,

মনসার ভাসান, শ্রীমন্ত-মশান, বেহুলা লক্ষীন্দর পালায়। গাজি এবং সত্যপীরদের নিয়ে অন্য আর এক ধরনের গান এবং জড়ানো পটও পাওয়া যায়। (আমাদের মনে রাখতে হবে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের মিশ্রণে একটি 'ব্যতিক্রমী' ধর্ম পালন করেন পটুয়ারা)।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ আখ্যান-বৃত্তের অনুপস্থিতি দুখুশ্যামের গানগুলিতে। সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে রচিত মঙ্গলকাব্যের যে পান্ডুলিপি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ব্দ্বীপ অঞ্চলে পাওয়া যায় তা শীতলা দেবীকে নিয়ে। এবং সেগুলি অতি জনপ্রিয় কাব্য-আখ্যান। অন্যদিকে তমলুক সংলগ্ন খুব সীমিত একটি ভৌগলিক এলাকায় অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী পর্বে রচিত হয়েছিল শীতলা দেবীর আখ্যান। টানা তিন দশক ধরে নয় জন কবি শীতলামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। দেবী শীতলা বসন্ত রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের দশকগুলিতে বসন্ত রোগের মহামারীর সঙ্গে ওই সাহিত্য সৃষ্টির কোনও সম্পর্ক নিশ্চয়ই রয়েছে। আজও তমলুক অঞ্চলের বহু গ্রামে শীতলা পুজিত হয় 'গ্রামের মা' হিসেবে।

শীতলা যদি হন মহামারী এবং দুর্যোগের ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া, তাহলে অন্নদা বা দেবী দুর্গার উদ্ভাবনাও একই রকমভাবে দুর্ভিক্ষের কারণে। 'খাদ্য-দাতা' দেবী অন্নদাকে নিয়ে আখ্যান অন্নদামঙ্গলও রচিত হয় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। দুর্ভিক্ষের পিছন পিছন আসে মহামারী। বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চলে বর্গি হানার পর থেকে, ১৭৪২ এবং তার পরবর্তী সময়ে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী দেখা দেয়। বারাণসীতে অন্নদার পুজো হয় সব সময়েই শিবের স্ত্রী হিসেবে। কিন্তু ১৭৫২-৫৩ সালে ভারতচন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গল রচনা করে দেবী অন্নদাকে সমকালীন বাঙালি হিন্দুর মনে একটি স্বতন্ত্র আসনে প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু আপাতত ঐতিহাসিক সত্যটা এই যে, মনসা এবং চন্ডীকে নিয়ে প্রচুর জড়ানো পট এবং গান রচিত হলেও, দুখুশ্যাম বা অন্য পটুয়ারা শীতলাদেবী এবং দেবী অন্নদাকে নিয়ে একটিও গান রচনা করেননি। অথচ দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গদেশে শীতলা এবং অন্নদা জনপ্রিয় হয়েছিলেন অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। (আর পান্ডুলিপির সূত্রে জানা যায় যে, চন্ডী এবং মনসার জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার বহু আগেই।) শীতলা ও অন্নদার এই অনুপস্থিতি খুবই অদ্ভুত, কিন্তু এর গ্রহণযোগ্য কোনও ব্যাখ্যাও নেই। এমন হতে পারে, অন্নদাকে কখনোই দুর্গা এবং গৌরীর থেকে পৃথক করে দেখা হত না। এবং স্থানীয় ভূস্বামীশ্রেণী শরৎকালে খুব জাঁক করে দুর্গাপুজো করতো। এমনও হতে পারে, ভূস্বামী এলিটদের বাইরে অন্নদার তেমন পরিচিতি ছিল না। অন্য দিকে, বসন্তকালে প্রত্যেক গ্রামেই শীতলাকে নিয়ে গান গাওয়া হত, তা রীতিমতো জনপ্রিয় ছিল। ফলে হয়ত, শীতলার আখ্যান উপস্থাপনার জন্য সেটাকেই একমাত্র সাংস্কৃতিক মাধ্যম বলে গ্রহণ করেছিল মানুষ। দুটি ব্যাখ্যার কোনটাই সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক নয়।

আর আছে সত্যপীরের পট। সত্যপীর হল হিন্দুদের প্রধান দেবতা নারায়ণ আর মুসলমান পীরের মিশ্রিত রূপ। সত্যপীরের গানে সন্তানহীন রাজা সিন্ধুর কাহিনী বর্ণনা করা হয়। সত্যপীরের আশীর্বাদে রাজা পুত্রের পিতা হন, কিন্তু তারপরেই রাজা ভুলে যান পীরকে। পরে রাজার বিপর্যয়ের মুহূর্তে ফের তিনি সত্যপীরকে স্মরণ করেন এবং বিপর্যয় থেকে উদ্ধার পান। কিন্তু এই গল্পে আর একটা বাঁক আছে। রাজার গল্প থেকে পটকথা লাফ দিয়ে পৌঁছে যায় জনৈক সনাতন মণ্ডলের দুর্ভাগ্যের কাহিনীতে। কৃপণ এই লোকটি, রাজার মতোই, দেবতার কাছে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি। পটের চিত্রণে আমরা দেখতে পাই বাঘ তাঁকে ওপর থেকে আক্রমণ করছে আর একটা কুমীর তেড়ে আসছে নিচ থেকে। একজন সেখানে হাজির হয়ে তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য সমবেদনা জানাতে থাকেন—এখানেই সনাতন মণ্ডলের গল্প শেষ। অভাগা এই লোকটিকে সত্যপীরের পটে এনেছেন দুখুশ্যাম। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দলত্যাগী মানুষের এই পরিণতি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এবং সেই স্মৃতিই সম্ভবত এখানে কাজ করেছে। তবে রাজা সিন্ধু থেকে লাফ দিয়ে সনাতন মণ্ডলে পৌঁছে যাওয়াটা আমাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল না। গল্পের এই চমকপ্রদ উল্লম্ফন আসলে অতীত থেকে বর্তমানে 'নেমে' আসা। সিন্ধু রাজার বিপর্যয়-মুক্ত হয়ে 'ঘরে' ফেরার পাশে সনাতন মণ্ডলের কাহিনী একটা আধুনিক উদাহরণ। এখানে সনাতন আধুনিক মানুষ। চিরকালের মতোই তিনি উপকার নিয়ে দাতাকে বিস্মৃত হন। কিন্তু এযুগে দেবতা আর ফিরে কৃপা করেন না। এখানে লক্ষ করার বিষয়টা হল এই যে, সত্যপীরের পটের এই চিত্রটির বিপরীত প্রতিবিম্ব পড়েছে যেন বন্যার পটে। বানপটে সময় 'ঊর্ধ্বমুখী'—দুখুশ্যাম সেখানে গঙ্গাদেবীর সঙ্গে কথোপকথনরত এক মাঝিকে হাজির করেন।

সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের কিছু ব্যক্তি এবং ঘটনা নিয়ে তৈরি আর এক ধরনের কিছু জড়ানো পট রয়েছে দুখুশ্যামের ঝুলিতে। শেষ পর্যায়ের এইসব পটে আছে 'মনোহর ফাসুড়ে' বা 'ট্যাক্সির মধ্যে খুন'-এর মতো রোমহর্ষক গল্প। এবং গল্প শেষ হয় এক দিব্য 'প্রকাশ'-এর মধ্যে দিয়ে, আবার কখনও কথোপকথনে। 'প্রকাশ'-এর এই রূপটিকে আমরা সহজেই 'ঐতিহাসিক' বলে চিহ্নিত করতে পারি। দুখুশ্যামের যে পটগুলি লন্ডনে 'আর্ট অব বেঙ্গল' একজিবিশন-এ প্রদর্শিত (হোয়াইটচ্যাপেল আর্ট গ্যালারি, ১৯৭৯) হয়েছিল, সেগুলি সবই এই পর্যায়ভুক্ত। (যেমন : চুয়াড় বিদ্রোহের শহিদদের নিয়ে তৈরি 'সাহেব পট'।) এই পর্যায়ে 'দুর্ভিক্ষের কাহিনী', 'কাকদ্বীপের ফেরি বিপর্যয়' এবং 'স্বাধীনতা ১৯৪৭'-এর মতো কিছু পট রয়েছে। বস্তুত শিরোনামগুলো বিবেচনা করলে 'বানপট'-কে নিশ্চিতভাবেই এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু একটা বিষয় আমাদের বোঝা দরকার যে দুখুশ্যামের 'গানে' রামায়ণ থেকে ১৯৭৮ সালে বন্যা পর্যন্ত সবই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। যেন একটিই অবিচ্ছিন্ন কথোপকথন। একটি অন্যটিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, আবার প্রত্যেকটি 'পালা' যেন সমগ্র কাজের

ভেতর থেকে একটা অবলম্বন পায়। অর্থময় এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই যেন বা কিছু একটার 'প্রকাশ' ঘটে।

দুখুশ্যামের এই বিষয় ও প্রতিক্রিয়াগুলির সম্মিলিত ঐতিহাসিক একীকরণ আমরা বাংলার 'জনপ্রিয়' সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখতে পাই। যেমন: তমলুক অঞ্চলে বসন্তকালে সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শীতলা দেবীর মঙ্গলকাব্যের আখ্যান নিয়ে পালা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দেবী হিসেবে শীতলার জনপ্রিয়তা অষ্টাদশ শতকে—সে সময় দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গদেশে কালান্তক বসন্ত রোগের মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল। তমলুক অঞ্চলের বেশিরভাগ গ্রামে আজও শীতলা কেন্দ্রিয় দেবী—গ্রামের 'মা'। শীতলার মন্দির ঘিরেই আবর্তিত গ্রামের ধর্মীয় জীবন। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ বহিঃশত্রুর হানা, অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর মতো প্রবল দুর্যোগের মধ্যে মঙ্গলকাব্যে শীতলার আখ্যান এসেছে। যদিও ষোড়শ শতকেই শীতলা বাঙালি হিন্দুর বাৎসরিক পার্বণের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে, কিন্তু তারও অনেক পরে ১৬৯০ সালে শীতলার প্রাধান্য বর্ণনা করে কাব্য রচিত হয়েছে বাংলায়। সে কবির নাম কৃষ্ণরামদাস। কলকাতার উত্তরে অল্প দূরেই একটি গ্রামে ছিল তাঁর বাস। এবং ওই বছরই সেই গ্রামে ইংরেজ 'কোম্পানি' তার বাণিজ্য শুরু করে। বস্তুত, এই ঘটনাগুলো অসম্পৃক্ত নয়। যতদূর মনে হয়, ওই এলাকার বসতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত রোগের মহামারীও চলছিল। শীতলাকে নিয়ে পরবর্তী কাব্যগুলি রচিত হয় ১৭৪৫/৫০ থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে। এই সময়ের মধ্যে অন্তত নয় জন কবি শীতলাকে নিয়ে আখ্যান রচনা করেন। এবং এই কবিদের কলকাতা থেকে তমলুকের মধ্যে তাঁদের বসবাস। ১৭৪২ থেকে ১৭৬২ সালের মধ্যে বর্গিরা একাধিক বার হানা দিয়েছে, লুটতরাজ চালিয়েছে বাংলায়। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে জিতে ইংরেজ গোটা অঞ্চলের দখল নিয়ে নেয় এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য জোর-জুলুম শুরু করে। ১৭৬৯ সালে শুরু হয় খরা, তার পিছনে পিছনে হাজির হয় দুর্ভিক্ষ এবং তারই পরিণতিতে ১৭৭০ সালে বসন্ত রোগের মহামারীতে ছেয়ে যায় দেশ। এর ফলে গোটা পূর্ব ভারতে দশ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। ঘটনা, আখ্যান বা ইতিহাসের কোনও যান্ত্রিক যোগাযোগে নয়, এতদঞ্চলের গ্রামে গ্রামে শীতলা পুজোর ভিত্তি নিশ্চিত-ভাবেই বিগত দুই শতাব্দীর অভিজ্ঞতার স্মৃতির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তমলুকের গ্রামগুলোতে শীতলা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই প্রধান দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। শীতলাকে নিয়ে যে যাত্রা পালা হয়ে থাকে তাও অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত আখ্যাননির্ভর। মৎস্যদেশের রাজা বিরাট কীভাবে শীতলার পূজারী হয়ে উঠলেন তার গল্প। শীতলা মৎস্যদেশ এবং তার রাজপরিবারকে বসন্ত রোগ দিয়ে আক্রমণ করেন। রোগের প্রকোপে গোটা দেশ উজাড় হয়ে যায়। শেষে বিরাট রাজা শীতলা দেবীর কাছে নতি স্বীকার করে তাঁর পুজো প্রবর্তন করেন। শীতলা পালার যাত্রা চলতে চলতেই এক সময় রাজা এবং শীতলাকে মঞ্চে রেখে রানি এবং রাজবধূরা

দর্শকদের মধ্যে নেমে পড়ে দর্শকদের কাছে চাল আর টাকা পয়সা "মাগ"তে শীতলা পুজোর জন্য। এই পালায় রাজার বাড়ির মেয়েরা শীতলা পুজো করে আজকালকার শীতলা পুজোর ধাঁচে—ভিক্ষা করে যে পুজো করার নিয়ম। শীতলার এই 'প্রকাশ'-এর ক্ষেত্রে বিরাট রাজার গল্প এবং আজকের গ্রামবাসীদের প্রতিক্রিয়া একাকার হয়ে যায়। পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ইতিহাস।

কিন্তু পুনরাবৃত্তির কী প্রয়োজন ইতিহাসে? ইতিহাসের আলোচনা থেকে কি মানুষ নতুন জ্ঞান অথবা সৌন্দর্য আশা করে? দুখুশ্যামের চিত্রণ, আবৃত্তি, বর্ণনা এবং তার সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের যে টুকরো গড়ে ওঠে তা দুখুশ্যামকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে চারপাশে। আমরা যখন দেখি দর্শকের সামনে দুখুশ্যাম তাঁর জড়ানো পট দেখিয়ে গান গাইছেন তখন আমরা আসলে সম্মিলিত জ্ঞানের উন্মেষ ও বিস্তার প্রক্রিয়ার সাক্ষী হয়ে যাই। একারণেই দুখুশ্যামের কাজে এত বৈচিত্র্য এসেছে এবং খানিকটা এজন্যই তাঁর কাজ যৌক্তিকতা অর্জন করেছে। প্রতিটি আখ্যানের সঙ্গে মিলে যায় বহু সাংস্কৃতিক ধারার নানা অনুষঙ্গ। এবং একজন পটুয়ার পক্ষেও শুদ্ধ কোনো তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব নয়। আবার পটুয়াদের গান শ্রোতারা শোনে নির্বিকার উদসীনতায়।

তবে এই পট দেখা / শোনার মধ্য দিয়ে দুটি প্রয়োজন সিদ্ধ হয় স্পষ্টতই ঃ প্রথমত, কীভাবে কী ঘটছে তা ব্যাখ্যা করে, যেমন বানপটে। আর দ্বিতীয়ত, এতে আত্ম-সচেতনতা এবং ইতিহাসের নতুন জ্ঞানের সম্মিলিত উন্মেষ ঘটায়। তা ছাড়া এই বানপটে এমন কতগুলো সত্য ঘটনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে যা পরিবর্তনের জ্ঞানকে চিহ্নিত করে। □

---

এই প্রবন্ধটি আমার অপ্রকাশিত ইংরাজি নিবন্ধ "The Scroll of the Flood" (1986) 'র ওপর ভিত্তি করে রচিত।

এই প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে প্রয়াত বন্ধু ডঃ তারাশিস ভট্টাচার্য ( তমলুক ) এর কাছে আমার ঋণ অশেষ। প্রবন্ধের তথ্য ও প্রসঙ্গ নির্দেশের জন্য নিম্নলিখিত আকরের উপরে আমি প্রধানত নির্ভরশীল :—

1. W. W. Hunter : *A Statistical Account of Bengal.* Vol. 3, (London 1876).
2. R. W. Nicholas : "The Village Mother in Bengal", in J. J. Preston (ed) *Mother Worship*, (Chapel Hill, North Caroline, 1982).
3. ——— : "The Golden Sitala and Epidemic Smallpox in Bengal", *Journal of Asian Studies, 41 : 1* November 1981

4. R. W. Nicholas & A. N. Sarkar : "The Fever Demon and the Census Commissioner : Sitala Mythology in 18th and 19th century Bengal," in Bengal *Studies in Literature Society and History*, (ed) M. Dairs (East Leansing michigan, 1976).

5. L. S.S. O'malley : *Bengal District Gazetteers : Medinipur* (Calcutta, 1911).

6. R. Skelton & M. Francis (Ed) : *Arts of Bengal : the Heritage of Bangladesh and Eastern India* (London, 1979).

7. সমসাময়িক সংবাদপত্রের সমাহার : *The Statesman*, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর

8. "Man Made Calamity", Economic and Political Weekly, Bombay, 14 October 1978.

"Some Self Help Too"—ওই—।

"DVC and Flood Control" —ওই—, 11 November 1978.

অনুবাদ : মিলন দত্ত